<NTL03><Translatio><Biography.><1981><Book.><রামকৃষ্ণ><ক্রিষ্টো>
<0685>

রামকৃষ্ণ ও তার শিষ্যগণ । স্পশারউড । রবিশেখর সেনগুপ্ত । অনুবাদ ।
একথা ঠিক যে , রামকৃষ্ণকে ভৈরবী সর্বক্ষণের জন্য অবতাররূপে ভাবতে পারতেন না । কোন মানুষের পক্ষেস্প তা সম্ভব নয় । সাময়িক বিস্মৃতি অনিবার্য্য । অপরাপর অবতারদের সঙ্গীদের ক্ষেত্রেও আমরা এস্প বিস্মৃতি লক্ষ্য করেছি । দেখেছি
কৃষ্ণসখা অর্জুনের মধ্যেও । শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতার একাদশ অধ্যায়ে অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের উল্লেখ আছে । তার বিশ্বাসকে দৃঢ় করার জন্য তিনি কৃষ্ণকে বিশ্বরূপ দেখাতে বলেছিলেন । কৃষ্ণ তার সখার অনুরোধ রাখলেন । ভয়ে ত্রাসে অভিভুত হয়ে অর্জুন সেস্প মহিমাময় রুপটি দেখলেন - দেখলেন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের লীলা । দেখলেন , যিনি মানব জাতির পিতৃস্বরূপ , যিনি বিশ্বককর্মা , তিনি যেন প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা । আর সেস্প অনলে নিক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিটি প্রাণী অবলুপ্ত হচ্ছে । গীতাভাষ্যের বর্ণনাটি এস্প রকম । আকাশে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা সহস্র সুর্য্যের যেমন গৌরবময় দীপ্তি , অসীম ঈশ্বর তেমনি দ্যুতিমান । সে রূপ দেখে ভয়ে ত্রাসে অর্জুন অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন । সেস্প মহাভীতির প্রেরণায় কৃষ্ণের পদপ্রান্তে লুটিয়ে ভয়কা□ত কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন , " তোমায় কৃষ্ণ বলেছি , সখা বলেছি , এ আমার ভ্রান্তি , এ আমার অজ্ঞানতা । ভালোবাসি বলেস্প তোমায় চিনতে পারিনি , তোমার মহান সত্বার উপলব্ধি হয়নি । কতভাবে তোমায় আমি অমর্য্যাদা করেছি । শয়নে জাগরণে , আহারে-বিহারে তোমার অন্তরঙ্গ হয়েছি - তোমায় পরিহাস করেছি । তখন কি কোনভাবে তোমার অমর্য্যাদা করেছি । যদি তেমনটি করে থাকি , হে অনন্ত প্রভু , আমায় ক্ষমা করো ! সখা যেমন সখাকে ,

পিতা যেমন পুত্রকে , দয়িত যেমন দয়িতাকে ক্ষমা করে , তেমনি আমাকেও তুমি ক্ষমা করো । "

এম্প মিনতি শুনে কৃষ্ণ অর্জুনকে পুনরাশ্বস্ত করলেন এবং পূর্বাবস্থায় ফিরে গেলেন । তখন পরম স্বস্তি পেয়েছিলেন অর্জুন । উল্লসিত হয়ে বলেছিলেন , " সখা কৃষ্ণ , এম্প তো সদানন্দ রমনীয় মানবদেহে আবার তুমি ফিরে এসেছো । তোমার মানব মুর্তি দেখে আমিও স্বস্তি পাচ্ছি । " অর্থাৎ স্পতিমধ্যেস্প কৃষ্ণের ঈশ্বর ভাবরূপের চেতনা অর্জুনের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল । তাস্প বিস্মৃতির মধ্যে আত্মগোপন করে কৃষ্ণকে মানব মুর্তিতে দেখবার প্রত্যাশায় তিনি অধীর হয়ে উঠেছিলেন । যীশু যখন দিব্য মুর্তি ধারণ করেছিলেন তখন তার স□র্কে পী।র , জেমন , এবং জনেরও এম্পরকম মনোভাব হয়েছিল ।

এখন প্রশ্ন হলো সর্বক্ষণের জন্য একজন অবতারের কাছাকাছি থাকা কি আমরা কামনা করি না ? তর্কের খাতিরে বলবো , করি । কিন্তু কার্য্যত বলবো , না করি না । কারণ অজ্ঞতার জন্য অবতারের প্রকৃত রূপটি আমাদের চোখে পড়ে না । অজ্ঞতা দুস্প রকমের এবং এদের মধ্যে প্রভেদটি কোথায় তা বোঝা দরকার । সাধারণ মানুষ যখন একজন যীশু বা রামকৃষ্ণকে দেখে , তখন তাদের স্থুল অনুভূতি দিয়ে তাদের সাধারণের পর্য্যায়ে নামিয়ে আনে । কিছু কিছু অসাধারণত্ব চোখে পড়লেও সেগুলি সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে অন্তর্গত হয় না । কারণ , উদ্বেগ আর অনিশ্চয়তা দরুন কোন ব্যাপারের গভীরে প্রবেশ করে শেষ পর্য্যন্ত দেখার মানসিকতা তাদের নাস্প । (যীশু ও পন্টীয়াস পীলেটের মধ্যে সেস্প আশ্চর্য্য সাক্ষাতের কথা বর্ণনার কথা স্মরণ করুন । কথোপকথনের সময় রোমান জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে পন্টীয়াসের ক্ষণিক আগ্রহ হলেও ছিল । কিন্তু যে মুহূর্তে তার নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের চিত্রটি প্রকটিত হলো সেস্প মুহূর্তে রোমানদের স□র্কে সব আগ্রহ সব কৌতুহল নিবারিত হলো ।) এটি এক ধরণের অজ্ঞতা । আবার কিছু মানুষ আছেন , যেমন

অর্জুন , যারা তাদের অন্ধ অনুরাগের জন্য অবতারের প্রকৃত রূপ দেখতে পান না । ভৈরবীর অজ্ঞতা ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর । সারদানন্দ বলেছেন যে , ভালোবাসার এম্প ানের কাছে মহতের মহত্ব ক্ষীণ হয়ে যায় । তখন মহামানব স□র্কে সাধারণ মানুষের ভয় ভক্তি অন্তর্হিত হয়ে যায় । পুত্রজ্ঞানে স্নেহ করতেন বলেম্প ভৈরবী তাকে

শিক্ষাদানের কথা ভাবতে পেরেছিলেন । এবং রামকৃষ্ণও তার প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে তন্ত্র সাধনা শুরু করেছিলেন ।

পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ বলতেন যে , প্রথমদিকে এম্প সাধনা নিয়ে কিছু কিছু সংশয় দেখা দিয়েছিল । কিন্তু ভবতারিনীর অনুজ্ঞা পাবার পর তার সব সংশয় দূর হয়ে যায় ।

মর্নি একবার তৈরী হয়ে যাবার পর তন্ত্রচর্চা নিয়ে তার আগ্রহ তীব্র হয়ে ওঠে এবং সাধনার ক্ষেত্রে তিনি দ্রুত উন্নতি করতে থাকেন ।

তন্ত্র সাধনার মূল লক্ষ্য হলো স্পন্দ্রিয়জ সব বাহ্য বস্তুর আড়ালে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা । এম্প উপলব্ধির ক্ষেত্রে দু'রকমের বাধা আছে । এক বাধা হলো প্রলোভন , অন্য বাধা হলো বিতৃষ্ণা । স্পহজাগতিক জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রেও এম্প বাধা

দু'ভাবে কাজ করে । চিকিত্সা করতে এসে পুরুষ ডাক্তারকে সুন্দরী নারী দেহের প্রতি প্রলোভন জয় করতে হয় , আবার রোগীর দেহের ক্যানসার জনিত পচনশীল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে সংক্রমণ আশংকাও কাটিয়ে উঠতে হয় । এম্প প্রলোভন ও বিতৃষ্ণা না কাটাতে পারলে , বাহ্য বস্তুতেম্প আমাদের মনোযাগ সীমাবদ্ধ থাকবে এবং অন্তর্নিহিত সত্য বস্তুতে পৌঁছাতে পারবে না । অবশ্য বাহ্য সত্বা অতিক্রম করে যখন আমরা ঈশ্বর-অস্তিত্ব উপলব্ধি করি , তখন এম্প প্রলোভন ও বিতৃষ্ণার ভাবটি থাকে না । সুতরাং তন্ত্রসাধনার মূল লক্ষ্য হলো সাধনাকে এমন এক কঠিন

নিগড়ে বাঁধা , যাতে মোহ আর ঘৃণা জয় করে সাধক তার অন্তর্লোকের দেবত্বকে উপলব্ধি করতে পারে ।

সাধনা করতে করতে রামকৃষ্ণ বেশ কিছু অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন । এম্প সিদ্ধাম্প শক্তিগুলি মনে প্রাণে তিনি চাননি , তাম্প আধ্যাত্ম সাধনের কোন ক্ষতি

না করেম্প এম্প ক্ষমতাগুলি তাকে ছেড়ে চলে যায় । যেমন , কথিত আছে যে রামকৃষ্ণ পশুপাখী কী পতঙ্গ ম্পত্যাদি যাবতীয় অন্ত্যজ প্রাণীর আহ্বান ও বিলাপধ্বনি যথাযথ বুঝতে পারতেন । শুনতে পেতেন সেম্প আহ্বানধ্বনি যা বিশ্বগত যাবতীয় ধ্বনির ঐক্যতান । এম্প প্রণবধ্বনি এত নিগূঢ় যে সাধারণ মানুষের শ্রুতিগম্য হয় না । কঠোর তন্ত্রসাধনা করে রামকৃষ্ণ আর একি প্রত্যক্ষ ফল লাভ করেছিলেন ।

সে সময় তার অঙ্গকান্তি হয়ে উঠেছিল আশ্চর্য্য দিব্যপ্রভাময় । সে দিব্যকান্তি অনেকেম্প

দেখেছেন । পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ নিজেম্প সেম্প রূপের ব্যাখ্যা করে বলেছেন ," আমার

অঙ্গ থেকে সে সময় স্বর্ণবিভাময় আলোকচ্ছটার বিচ্ছুরণ হতো । লোকে আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে থাকতো আমার দিকে । তাম্প সর্বক্ষণম্প শরীরে শাল জড়িয়ে লোকানয়নের আকর্ষণ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখতাম । ভাবতাম হায় ! এরা আমার বাহ্য রূপ দেখেম্প আত্মহারা অথচ যিনি আমার অন্তর্লোকবাসী - দিব্যসত্তা , তার প্রতি এরা কত উদাসীন । জগন্মাতার কাছে আকুল হয়ে তাম্প প্রার্থনা করতাম । বলতাম , " মাগো , আমার এম্প বাহ্যরুপ নিয়ে আমার অন্তর্রূপ ফিরিয়ে দাও । " মা আমার আকুল কান্না শুনেছিলেন । অবশেষে অঙ্গলাবণ্য অদৃশ্য হয়ে ধীরে ধীরে দেহপী বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল । "

যে শব্দগুলি সাধারণভাবে স্পন্দ্রিয়জভাব প্রকাশ করে , রামকৃষ্ণের কাছে সেগুলি উচ্চভাবার্থে প্রকাশিত হতো । যেমন স্ত্রীজাতির গোপনাঙ্গ যোনির মধ্যে তিনি ত্রিজগৎ প্রসবিনী ব্রহ্মযোনি দর্শন করতেন । তিনি ভাবতেন , যে বর্ণমালা দিয়ে বেদ বেদান্ত লেখা হচ্ছে সেস্প বর্ণমালার সাহায্য নিয়েস্প রচিত হয়েছে নানা অশ্লীল শব্দ । সুতরাং যে সব বাক্য সাধারণভাবে অশ্লীল বলে প্রতীয়মান হয় সেগুলিও তার কাছে পবিত্র মনে হতো ।

রামকৃষ্ণের তন্ত্রসাধনা শুরু হয় ১৮৬১ সালে , শেষ হয় ১৮৬৩ সালে । এস্প দীর্ঘদিনের

সাধনায় তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে শক্তিসাধিকা (ভৈরবী) ছাড়াস্প গুঢ় তন্ত্রক্রিয়া শুদ্ধ সংযমের সঙ্গে পালন করা যায় । তবে এ কথাঁি ভুললে চলবে না যে , রামকৃষ্ণের মতন উচ্চতর অধ্যাত্মসাধকের পক্ষেও আত্মসংযমের শিক্ষা সহজ হয়নি ।

পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ নিজেও স্বীকার করেছেন যে , তিনিও একবার কামমোহিত হয়েছিলেন । মূল কারণ হলো অহংকার । //

তাড়াতাড়ি হাতের কাছে যা গহনা ছিল সেগুলি সব পরিয়ে রামকৃষ্ণের রমণীবেশ সর্বাঙ্গসুন্দর করে দিলেন । তারপরে বীজমন্ত্র জপ করার মত কানে কানে বললেন " এখন আরতির সময় - পঞ্চ প্রদীপের আলো জ্বেলে চামর দুলিয়ে মায়ের আরতি করবে না ? " দেখা গেছে ভাববেশ কাঁিয়ে বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়ে আনতে রামকৃষ্ণের কানে কানে বারবার ভাবসঞ্চারকারী বিষয়ের বীজমন্ত্র জপ করতে হয় । তাহলেস্প তার ভারাহিত্য ঘটে । ব্যাপারাঁি জগদম্বা জানতেন । ফলে দেবী দূর্গার নামোল্লেখ মাত্রস্প রামকৃষ্ণের ভাবরাহিত্য হলো । বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলে জগদম্বার সাথে রামকৃষ্ণ

পূজাসনে এসে দাঁড়ালেন । আরতি শুরু হলো । চামর হাতে রামকৃষ্ণ যখন দেবীকে

ব্যজন করছিলেন তখন মথুরমোহন এসে দাঁড়ালেন । দূর থেকে দেখলেন তার স্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে একজন অপরিচিতা মহিলা হাতে চামর নিয়ে ব্যজন করছেন । বেশভূষা

ঠাঁঠমকে মহিলাকে রীতিমত বেশ মহিয়সী দেখাচ্ছিল । মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকতে থাকতে মথুর ভাবলেন নিশ্চয়ম্প ম্পনি কেন ধনী গৃহিণী এবং জগদম্বার বিশেষ নিমন্ত্রিতা । একু কৌতুহল ছিলম্প । তাম্প আরতি শেষ হতেম্প স্ত্রীর কাছে গিয়ে এম্প ব্যক্তিত্বস□ন্না মহিলারি খোঁজ খবর নিতে লাগলেন । স্বামীর কৌতুহল দেখে মুখটিপে একু হেসে জগদম্বা বললেন , " চিনতে পারলে না ? উনি যে বাবা ।" মথুর স্তম্ভিত । ঘোরু কু কাতে স্ত্রীকে বললেন , " চেনা না দিলে বাবাকে কেউ চিনতে পারে না । "

নিজের মধ্যে রমণীভাব আরোপ করে ব্রজগোপিনীদের মতন কৃষ্ণপ্রেমে অধীর হয়ে উঠেছিলেন রামকৃষ্ণ । বিরহব্যাকুল শরীর যন্ত্রনায় অবশ হয়ে যেত । আহার নিদ্রা ভুলে তিনি শুধু কাঁদতেন । শরীরের রোমকুপ দিয়ে বিন্দু বিন্দু রক্তক্ষরণ হতো । রামকৃষ্ণ বুঝেছিলেন যে রাধিকার কৃপা ছাড়া কৃষ্ণ দর্শন অসম্ভব । তাম্প ব্যাকুল হয়ে

রাধাধ্যানে প্রবৃত্ত হলেন । এমনি করে কিছুদিন কাানোর পরে তার স্বপ্ন সফল হলো । কৃষ্ণ দর্শন লাভ করে রামকৃষ্ণ ধন্য হলেন । একদিন এক আশ্চর্য্য ঘনা ঘল । তদগতচিত্তে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শুনছেন । শুনতে শুনতেম্প ভগবান কৃষ্ণের জ্যোতির্ময়

রূপ দর্শন হলো । দেখলেন দড়ির মতো একা জ্যোতি ভাগবত গ্রন্থ ছুঁয়ে রামকৃষ্ণের বক্ষসংলগ্ন হয়ে তিন বস্তুকে একত্র করে একি ত্রিকোণ আকার নিল । পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ বলতেন , " সেম্প অদ্ভুত দৃশ্য দেখার পর বুঝেছিলুম যে ভাগবত , ভক্ত ও ভগবান তিন এক , এক তিন । "

রামকৃষ্ণ কিভাবে দ্বৈতভাবসাধনের চরম উপলব্ধিতে পৌঁছেছিলেন তা আমরা দেখেছি ।

কিন্তু মাস কয়েক না যেতেম্প তার জীবনে সŽ ূর্ণ বিপরীত এক উপলব্ধি হলো । সে উপলব্ধি চরম অদ্বৈতবাদ - অর্থাৎ ব্রহ্মসত্তার সঙ্গে স□ূর্ণভাবে লীন হওয়া , যা কিনা বেদান্তের শিক্ষা । (আদি শাস্ত্রগ্রন্থ বেদের মধ্যের মধ্যেম্প এম্প দর্শনটি নিহিত বলে এর নাম বেতান্ত দর্শন ।)

সাধনার এম্প নতুন ধারা শুরু হলো ১৮৬৫ সালে দক্ষিণেশ্বরে সন্ন্যাসী তোতাপুরীর আগমনের সময় থেকে । শঙ্করাচার্য্য প্রবর্তিত দশনামী স□দায়ের একটি স□দায়ের নাম ‘ পুরী ’ স□দায় । রামকৃষ্ণ তখনো তোতাপুরীর পূর্ণ নাম ব্যবহার করেননি । কারণ পরবর্তী কালে তিনি তোতাপুরীকে গুরুর পদে বরণ করেছিলেন । আসলে তোতাপুরীকে তিনি ‘ নাঙা ’ বলে ডাকতেন কারণ জীবনের অধিকাংশ সময় এম্প তোতাপুরী সমপূর্ণ নাঙ্গা হয়েম্প কা াতেন ।

পুরীদের মধ্যে এক উপ-স□দায় হলো ‘ নাগা ’ এবং তোতা ছিলেন এম্প নাগাদের একজন । একেবারে শিশু বয়সেম্প লুধিয়ানার (পাঞ্জাব) এক নাগা মঠে তোতা সাধনসঙ্গী হন । মঠে সন্ন্যাসীর সংখ্যা ছিল সাতশ’ । কঠোর কৃচ্ছ্রতার জন্য স□দায়টি সুবিদিত ছিল । স□দায়ের অন্তর্গত সন্ন্যাসীদের একে একে সবরকম ঐহিক আসক্তি থেকে মুক্ত হবার শিক্ষা দেওয়া হতো । এমনকি আহার পানীয় নিয়েও তারা সংযমী ছিলেন । শরীর নগ্ন রেখে তারা কঠোর তপশ্চর্য্যা করতেন - যাতে শরীর দৃঢ় ও কঠিন হয় । কালে সন্ন্যাসীদের শিরোমণি হয়েছিলেন তোতা । অবশ্য বেশিদিন তিনি মঠবাসী থাকেননি । পরিব্রাজক হয়ে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতেম্প তিনি ভালোবাসতেন । আর এম্পভাবেম্প ঘুরতে ঘুরতে তিনি একদিন দক্ষিণেশ্বরে এসে পৌঁছেছিলেন ।

নাগা উপ-স□দায়ের সন্ন্যাসীরা আগুনকে খুবম্প পবিত্র ভাবেন । যখন যেমন

অবস্থাতেম্প থাকুন না কেন , ধুনি জ্বেলে তার পার্শীতে বসে ধ্যান করবেনম্প । সাধনার সবকিছু সব ধুনির আগুনকে ঘিরেম্প । খাওয়া শোওয়াও এর অন্তর্ভূক্ত । নাগা সন্ন্যাসীরা কখনো গৃহবাসী হননি । তোতার একমাত্র স□দ ছিল একজোড়া চিমটা । অন্য কাজ ছাড়াও চিমটা দিয়ে আত্মরক্ষাও চলতো । আর ছিল একটি লোটা । তোতা যখন দক্ষিনেশ্বরে এলেন তখন তিনি মধ্যবয়সী প্রৌঢ় । গড়নে বেশ লম্বা , স্বাস্থ্য রীতিমত বেশ মজবুত । হঠাৎ দেখলে বেশ বলশালী বলে মনে হবে । ধ্যান করা বা ঘুমোবার সময় তোতা সর্বদা গায়ে একখানি কাপড় জড়িয়ে নিতেন ।

দেশে ফেরার পথে তোতা দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন । নর্মদার তীরে আর পুরীর দেবস্থানগুলি দর্শন করে ফিরছিলেন । পথে পড়ল দক্ষিণেশ্বর । ভেবেছিলেন দিন তিনেক থাকবেন । সাধারণত কোন দেবস্থানেম্প তিন দিনের বেশী থাকতেন না । প্রাচীন শাস্ত্রনির্দেশ মতন তিনি মনে করতেন যে , আসক্তি কাটাতে হলে কোথাও থেমে থাকতে নেম্প । শুধুম্প চলা - প্রবাহমান নদীর মতো শুধু বয়ে চলা । চরৈবেতি । রামকৃষ্ণকে দেখে , তার সঙ্গে ঘনিষ্ট হবার বাসনায় তোতা যে তার পরিকল্পনা বদলে ফেলছিলেন , তা নয় । কারণ রামকৃষ্ণের কোন কথাম্প তোতা জানতেন না এবং ভৈরবীর মতন প্রত্যাদেশ পাওয়া বা দেবীদর্শন তার হয়নি । মন্দির চত্বরে পৌঁছেম্প তোতা প্রথমে গেলেন ঘাটের প্রশস্ত চাঁদনিতে । অনেকেম্প ছিলেন - একপাশে রামকৃষ্ণও আনমনে বসে ছিলেন । একছু চাদর দিয়ে তিনি গা মুড়ে বসে ছিলেন । তবুও তোতার সন্ধানী চোখ তাকে খুঁজে পেল । একনজর দেখেম্প তোতা বুঝতে পারলেন যে , এ যুবক আর পাঁচজন সাধারণ থেকে আলাদা ।

তোতার স্বভাবটি ছিল বেশ উদ্ধত , প্রকৃতি দাম্ভিক । সেম্পভাবেম্প সরাসরি রামকৃষ্ণের

কাছে এসে দাঁড়ালেন , তারপর বললেন , " তোকে উত্তম অধিকারী মনে হচ্ছে । বেদান্ত সাধনা করবি ? "

আকস্মিক হলেও রামকৃষ্ণ একটু ও বিচলিত হলেন না । খুব শান্ত স্বাভাবিক গলায় জবাব দিলেন , " কি করবো তার আমি কি জানি ? মা সব জানেন । তিনি যদি হ্যাঁ বলেন , তবে করবো । " তোতা বললেন , " তবে মাকেম্প জিজ্ঞেস করে আয় ।

জিজ্ঞেস করেম্প সোজা আসবি - এখানে আমি বেশিক্ষণ থাকবো না । "

তোতা ভেবেছিলেন রামকৃষ্ণ বুঝি তার মানবী মায়ের অনুমতি নিতে চলেছেন । কিন্তু আশ্চর্য্য হয়ে দেখলেন তোতা রামকৃষ্ণ সোজা গিয়ে ঢুকলেন কালীঘরে । খানিক পরেম্প

যখন বেরিয়ে এলেন তখন একেবারে অন্য মানুষ । ভাবে লমল - অর্ধচেতন অবস্থা । সোজা তোতার কাছে এসে দাঁড়ালেন রামকৃষ্ণ । তারপর হর্ষোজ্জ্বল্ল মুখে বললেন , " মাকে জিজ্ঞেস করলুম । মা বললেন , " যা শেখ । তোকে শেখাবে বলেম্প অদ্দুর থেকে সন্ন্যাসী এসেছে । " //

এমন ইকারী আদেশ পেয়ে পুরোহিতরা অবাক । তারা পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করছেন - একী অর্বাচীন আজ্ঞা । রামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে যেমনি ঘটেছিল , এবারও যেন তারম্প পুনরাবৃত্তি ঘটলো । অর্থাৎ সবাম্প সিদ্ধান্ত করে বসলো যে মথুরের নিশ্চয়ম্প মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে । কিন্তু মাথা খারাপ বলে সিদ্ধান্ত নিলেও মথুর তো কর্তা । তার অনভিমতে পুরোহিতরা কোন কাজম্প করতে পারবেন না । তিনি না চাম্পলে মায়ের বিসর্জনও হতে পারে না । এবং অর্বাচীন মনে হলেও তার এম্প আজ্ঞা পুরোহিতরা মানতে বাধ্য । আর আশ্চর্য্য ভাগ্যের পরিহাস । শেষ বিপদ উদ্ধারের জন্য সবাম্পকে রামকৃষ্ণের কাছে ধর্ণা দিতে হলো ।

মথুরের বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে রামকৃষ্ণ বললেন , " তোমার এত ভয় কিসের ? কে বললো মাকে ছেড়ে তোমায় থাকতে হবে ? আর বিসর্জন দিলেম্প বা তিনি যাবেন কোথায় ? ছেলেকে ছেড়ে মা কি কখনো থাকতে পারে ? তিনদিন বাম্পরে দালানে বসে মা তোমার পূজো নিয়েছেন , আজ থেকে তোমার আরও কাছ থেকে - সর্বদা তোমার হৃদয় মন্দিরে বসে তোমার পূজো নেবেন । " স্পর্শের কী মোহিনী শক্তি । যেন জাদুবলে তার কথাগুলি প্রাণময় হয়ে উঠেছিল । মথুর বুঝতে পেরছিলেন তার এম্প ভয় কত অর্থহীন । প্রকৃতিস্থ মথুর সেদিন যেন শতগুণ আনন্দে উচ্ছম্বিত হয়ে উঠেছিলেন । বলাবাহুল্য মুর্তি বিসর্জনের ক্ষেত্রে আর কোন বাধা হয়নি ।

ভাববিষ্ট অবস্থায় রামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে তার শিষ্যদের স□র্কে ভবিষ্যৎ বাণী করতেন । একদিন তেমনি মথুরকেও বললেন , " যদ্দিন তুনি বেঁচে থাকবে ততদিন আমিও দক্ষিণেশ্বরে থাকবো । " কর্থাি শুনে মথুরের ভালো লাগলেও স্ত্রী ও পুত্রের কথা ভেবে একু চিন্তিত হয়েছিলেন । দীনভাবে বললেন , " বাবা , আমার স্ত্রী জগদম্বা আর ছেলে দ্বারকাও যে আপনার ভক্ত । আমি মরলে তাদের ছেড়ে যাবেন ? " সেদিন মথুরকে আশ্বস্থ করে রামকৃষ্ণ বলেছিলেন ," তবে তাম্প হোক । যদ্দিন ওরা দুজনে বেঁচে থাকবে ততদিন আমি এখানে থাকবো । " ঠিক তেমনম্পি ঘটেছিল । শুধু মথুরম্প নন , ১৮৮১ সালের মধ্যে জগদম্বা ও দ্বারকাও ম্পহধাম ছেড়ে চলে যান । অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বর থেকে রামকৃষ্ণের বিদায় নেবার কিঞ্চিদধিক তিনবছর আগের ঘনা সৌি ।

রাণী রাসমণির মৃত্যুর পর তার সমস্ত স□ত্তি তার দুম্প মেয়ে পদ্মমণি ও জগদম্বার মধ্যে সমানভাগে ভাগ হয়ে যায় । একদিন পদ্মমণির ভাগের পুকুরে জগদম্বা চান করতে গেছেন । গিয়ে দেখেন শালুক ফুলে ভর্তি হয়ে গেছে পুকুর । ভাবলেন স্নান শেষে গৌাকতক ফুল নিয়ে যাবেন । যখন ফুল

ছিঁড়ছিলেন তখন পাশ দিয়ে রামকৃষ্ণ যাচ্ছিলেন । পদ্মমণির ভাগের পুকুর থেকে জগদম্বাকে ফুল ছিঁড়তে দেখে প্রায় ছুটে গিয়ে রামকৃষ্ণ পদ্মমণিকে এম্প চুরির খবরটি দিলেন । রামকৃষ্ণের আচরণ দেখে পদ্মমণির বেশ আমোদ হচ্ছিল । তিনি ভাবতেও পারেননি এমন একটি তুচ্ছ ব্যাপারের জন্য রামকৃষ্ণ এতখানি উতলা হয়ে উঠবেন । তবুও যেন খুব বিরক্ত হয়েছেন এমনি ভাণ করে বললেন , " ওমা ! তাম্প নাকি ? তা এতো ভারি অন্যায় । " বলতে বলতে জগদম্বাও এসে হাজির । সব শুনে দু'বোন রামকৃষ্ণকে অপদস্ত করতে লাগলেন । কিন্তু কপট ক্রোধ বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারলেন না । দু'বোনে খিল খিল করে হেসে উঠলেন । রামকৃষ্ণ অবাক ! কিছুতেম্প যেন ওদের রঙ্গ তামাসার কারণটি বুঝে উঠতে পারছিলেন না । তাম্প অবাক হয়ে বললেন , " তোমাদের সংসারের নিয়ম ঠিকমতো বুঝি না । তবে সম্পত্তি যখন ভাগ হয়ে গেছে তখন অনুমতি ছাড়া আর একজনের ভাগের থেকে কিছু নেওয়া উচিত নয় । " দু'বোন তখনো হাসছেন । রামকৃষ্ণের সরল মধুর বালকভাব দেখে সেদিন তারা মুগ্ধ ।

মথুর ও রামকৃষ্ণের মধ্যে সম্পর্কটি ছিল বিচিত্র । এবং প্রায়শম্প সেম্প সম্পর্কের বদল হতো । মথুর কখনো তাকে পিতার মতন দেখতেন - যেন রামকৃষ্ণ তার গুরু । কখনো বা দেখতেন ইচ্ছাকারী যুবকের মতন । মথুর নিজেও মাঝে মাঝে দায়িত্বজ্ঞানহীন বালকের মতন ব্যবহার করতেন । তবে মথুরের ব্যবহার সব সময় খুব নির্দোষ হতো না । যেমনটি সেবার হলো । 'প্রতিবেশী এক প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদারের সঙ্গে অকারণ দাঙ্গা বাধিয়ে দিলেন - সদলবলে সেখানে চড়াও হয়ে এমন হামলা করলেন যে অনেক মানুষ খুন হলো । ঘটনাটি আদালত অবধি গড়ালো । কোর্ট থেকে মথুরের নামে পরোয়ানা জারি হলো । অপরিণামদর্শী বালকের মতন মথুর ছুটে গেলেন রামকৃষ্ণের কাছে । রামকৃষ্ণ তাকে পিতার মতন শাসন তো করলেনম্প উপরন্তু বললেন যে মথুরকে এর পরিণাম ভোগ

করতেম্প হবে । কিন্তু মথুরও জিদ করতে লাগলেন ; এ বিপদ থেকে তাকে বাঁচাতেম্প হবে । শেষমেশ রামকৃষ্ণ বললেন , " দেখি - মা কি চান ? তিনি যেমনি চাম্পবেন তাম্প হবে । " তাতেম্প মথুর খুশি । অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জেনেছেন যে রামকৃষ্ণ এম্পভাবেম্প ভরসা দেন । বলাবাহুল্য মথুরের নামে শেষ পর্য্যন্ত ফৌজদারী মামলাি আদালতে ওঠেনি ।

রামকৃষ্ণের প্রতি মথুরের উদারতার অনেক ঘনার কথা আমরা জানি ।াকা পয়সার ব্যাপারে রামকৃষ্ণের কোনরকম সাংসারিক বুদ্ধিম্প ছিল না । ফলে এম্প উদারতার বেশ কঠিন পরীক্ষা হয়ে যেত । বিশেষ করে পুরাণ কাহিনী নিয়ে যাত্রাপালা দেখার সময় এমন ঘনা প্রায়ম্প ঘতো । হয়তো কারও উঠোনে বা ফাঁকা মাঠে যাত্রাপালা দেখতে গেছেন রামকৃষ্ণ ; মথুর তার হাতে একশাকার একি বাণ্ডিল দিয়ে গেছেন - উদ্দেশ্য পছন্দমতো অভিনেতাকে খুশিমতো তিনি পুরষ্কার দিতে পারবেন । কিন্তুাকা পয়সার উপর যার মোহ নেম্প তার কি হিসাবের জ্ঞান থাকে ! ফলে , খুশি হয়ে রামকৃষ্ণ হয়তোাকার পুরো থোকাম্প একজন অভিনেতার হাতে তুলে দিতেন । এমন ঘনা যখন ঘতো , তখন মথুর আবার তার হাতোকা দিয়ে আসতেন । সেবারও রামকৃষ্ণ হয়তো তেমনি করতেন ।

শেষমেস নিজের পরনের ধুতি , চাদর উড়ানি খুলে দিয়ে হয়তো একেবারে উলঙ্গ হয়ে যেতেন ।

সেবার মথুরকে নিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে রামকৃষ্ণ দেখা করতে গেছেন । দেবেন্দ্রনাথ ব্রম্মোপাসক আবার ধর্মসংস্কারকও ।

হিন্দু ধর্মের সনাতন কিছু বিশ্বাস এবং প্রথার সংস্কারের উদ্দেশ্যেম্প ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টি । এম্প সমাজের একি শাখার শিরোমণি ছিলেন আচর্য্য দেবন্দ্রনাথ । মথুর

ও দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু কলেজে একসঙ্গে পড়াশুনা করেছেন । দু'জনের মধ্যে বেশ স□ীতি । তাম্প অতবড় মানী লোক হলেও দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে " তাতেম্প মথুর খুশি । অভিঙ্গতা থেকোনো গোল হয়নি ।

রামকৃষ্ণ শুনেছিলেন যে , অধ্যাত্মসাধনায় দেবেন্দ্রনাখ অনেকখানি এগিয়ে গেছেন । তাম্প সাক্ষাতের জন্য তার এম্প আকুলতা । দেখা হতেম্প সরাসরি দেবেন্দ্রনাথকে গায়ের জামা খুলে বক্ষঃস্থল দেখাতে বললেন । দেবেন্দ্র তাম্প করলেন - সম্ভবত ঈষৎ আত্মতুষ্টি নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ তাম্প করলেন । কারণ তিনি জানতেন যে , তার গৌরবর্ণ রক্তিম বক্ষঃস্থল নিবিড় ধ্যানময়তার লক্ষর্ণম্প প্রকাশ করে । এরপর বেদ থেকে কিছু পাঠ করে শোনালেন । বললেন , " এম্প জগৎ যেন একি ঝাড়বাতি । আর প্রাণী জীব যেন এক একি ঝাড়ের আলো । ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন তার মহিমা প্রচারের জন্য । ঝাড়ের আলো নিভে গেলে সব অন্ধকার , ঝাড় পর্য্যন্ত দেখা যায় না । " বেদের এম্প ব্যাখ্যি রামকৃষ্ণকে সেদিন খুব অভিভূত করেছিল ; কারণ পঞ্চবীতে যখন ধ্যান করতেন তখন তার ঠিক এম্পরকমম্প দর্শন হয়েছিল ।